জার্নাল থেকে

শিবনারায়ণ রায়

বন্যগোলাপের সুগন্ধঃ

তসলিমানাসরিনের দ্বিখন্ডিত

বিবর্তনেরবহুযুগ ব্যাপী কর্মকান্ডে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে শুধুমাত্র ইতিহাসেরউপাদান নয়, ইতিহাসের নির্মাতাও বটে। অর্থাৎ অন্য প্রাণীর মতো সেওপ্রকৃতির নিয়মাবলী মানতে বাধ্য ঠিকই, কিন্তু সেই নিয়মাবলীকে নিজেরবিকাশের প্রয়োজনে নিয়োগ করবার সামর্থ্যেও সে জীবজগতে তুলনাহীন। এইগুমস্তিষ্ক তাকে দিয়েছে একদিকে উদ্ভাবনার অমিত শক্তি, অন্যদিকে আত্মনির্মাণেরঅভুতপূর্ব সম্ভাবনা।

অবশ্যসম্ভাবনা এবং তার বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। যেমন ভিতরেরতেমনই বাইরের নানা প্রবল বাধা আজও অধিকাংশ মানুষের মনুষ্যত্বেরবহুমুখী বিকাশকে ব্যাহত করেছে। ভয়, লোভ,ঈর্ষা,ক্ষমতার আকাঙ্খা ,প্রেম, সহযোগ, বিবেকিতা ও যুক্তিশীলতাকে শুধু দুর্বল করেনা অত্যাচারসংঘর্ষ এবং সর্বনাশের কারন হয়ে দাঁড়ায়।অপর পক্ষে গত পাঁচ ছয়হাজার বছরে মানুষের রচিত বিবিধ সভ্যতার সম্প্রতিতম পর্বে পৌঁছেও আমরাএমন কোনো সমাজব্যবস্থা উদ্ভাবনা করতে পারিনি যেখানে শক্তিমান এবং বিত্তবানঊনজনের প্রতিপত্তির নীচে অগণিত অধিজন বঞ্চিত জীবনযাপন করে না। বঞ্চিত অধিজনের বিক্ষোভযাতে বিপ্লবের রূপ না নিতে পারে তার জন্য শক্তিমান ঊনজনের হাতে আছেপ্রবল রাষ্ট্রশক্তি, সেনাপুলিশ এবং ধর্মীয় প্রতারণার নানা কৌশলীবিধিব্যবস্থা। সভ্যতার কেন্দ্রে এই যে সঙ্কট - মনুষ্যত্বেরপ্রাজাতিক বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষের মনুষ্যত্বহীন ধ্যানধারণাও জীবনযাত্রা- একুশ শতকের সূচনাতেও তার কোনো অভিজ্ঞতাসিদ্ধ সমাধান এখনোপাওয়া যায় নি। বাইরের বাধার মুল্যবান কিন্তু আংশিক বিশ্লেষন করেছিলেনমার্ক্স । ভিতরের বাধাগুলির উপরে আলোকপাত করেছিলেন ফ্রয়েড।কিন্তু দেড় শতক পরেও বুর্জোয়াদের ''ঝিায়ন''প্রবলতর হয়েছে বৈ হ্রাস পায়নি এবং তাদের লোভের বিষ ''সর্বহারা''শ্রেনীর মনেও সংক্রমিত হয়েছে। অপর পক্ষে বড়দ্রুপ্সব্দ বা মারন শক্তিকে যে ড্রব্জপ্সব্দ বা জীবন শক্তি বশে আনতে পারবে স্বয়ং ফ্রয়েডআইনষ্টাইনকে এমন ভরসা শেষ পর্যন্তদিতে পারেন নি।একুশ শতকের ভু মিকা হিসাবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো যেমন তার প্রসঙ্গিকতা হারায় নি তেমনি হারায় নি ফ্রয়েডের দ্য ফিউচার অব্ অ্যানইলিউশ্যান ।সংকটের দুরপনেয়তা সত্য, তবু ইতিহাস এবং নিজেদেরঅভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, সব যুগে এবং সব সমাজেই এমন কিছু স্ত্রী- পুষদেরদেখা যায় যাঁরা শুধু মনুষ্যত্বের অমিত সম্ভাবনা বিষয়ে সচেতন নন,নিজেদের জীবনেসম্ভাবনার অনুশীলনে নিবেদিত-প্রাণও বটে। নানা কারণের সমাবেশে কোনোকোনো যুগে কোনো কোনো সমাজেএই প্রকৃতির অনন্যতন্ত্র স্ত্রীপুষ খুবইদুর্লভ, আবার কোনো কোনো সময়ে কোনো কোনো দেশে অনুকুল ঘটনারাজিরসমাবেশে এই প্রকৃতির বেশ কিছু মানুষ একই সঙ্গেদেখা দেন। তখন সেখানে যাসূচিত হয় পশ্চিমে তাকে বলা হয় রেনেসাঁস, বাংলায় নবজাগরণ।এ ব্যাপারটিযুগে যুগে দেশে দেশেঘুরে ফিরেই দেখা যায়।

উনিশ শতকের বাংলায় এমনই একটানবজাগরণ সূচিত হয়েছিল যার আদি পুষ ছিলেন রামমোহন , যার কয়েকজনপ্রধান ব্যাত্তিত্ব ছিলেন ডিরোজিও , অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, মাইকেল এবংবঙ্কিম, যার চরম উৎকর্ষ ঘটে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভায়।কিন্তু লক্ষনীয় এই নবজাগরণে , ডিরোজিওকে বাদ দিলে, এঁরা প্রায়সকলেই ছিলেন হিন্দু উচ্চবর্গের পুষ। বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক - আর্থিকগঠনের ঐতিহ্যে এর কারণ নিহিত ছিল। উচ্চবর্গের মেয়েরা

ছিলেন অন্ধকারঅন্তঃপুরের বন্দিনী ; আর মুসলমানদের মধ্যে আশরফ্-রা ছিলেন মনেরদিক থেকে বোবা, কালা, অন্ধ, আর সংখ্যাগু আজলাফ্-রা ছিলেননিরক্ষর, চাষী, জোলা, মজুর। বিশ শতকে এ অবস্থার কিছু কিছুপরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমে রোকেয়া, পরে নজল এবং ঢ়াকার'শিখা' আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাংলার মুসলিম এবং নারী নবজাগরণেরসূচনা ঘটে। দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত অবক্ষয় ঘটে। পূর্ববঙ্গেরমানুষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে , স্বাধীন বাংল াদেশেরপ্রতিষ্ঠা করে বটে, কিন্তু সেখানে যাঁরা সাংস্কৃতিক নবজাগরণেরনেতৃত্ব দিতে পারতেন তাঁরা অনেকেই স্বাধীনতা অর্জনের আগেই শহীদ হন। বিগততিন দশক ধরে সেখানে একটা জীবনমৃত্যু সংগ্রাম চলছে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেপ্রগতির, মনুষ্যত্ব- প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে মনুষ্যত্ব -বিরোধী সংগঠিত শক্তির।

গত শতকের শেষ দশকে তসলিমানাসরিনের প্রায় নাটকীয় আর্বিভাবকে এই ঐতিহাসিক পটভুমিতে দেখাসঙ্গত বোধ করি। এখন থেকে দুশো বছরের বেশি আগে ফরাসী বিপ্লবেরসুচনাপর্বে ইংরেজি ভাষার দুটি বীজগ্রন্থ রচিত হয়েছিল ; টমাসপেইন-এর রাইট্স্ অব্ ম্যান (প্রথমখন্ড ১৭৯ দ্বিতীয় খন্ড ১৭৯২); আর মেরি ওয়লস্টোনক্র্যাফট -এর এ ভিনডিকেশ্যান অব্ দ্য রাইটস্ অব্ উ্যম্যান(১৭৯১-৯২) । প্রথমটি অবিলম্বে আধুনিক সভ্যতার একটিবীজগ্রন্থ হিসেবে স্ বীকৃতি পায়। এ দেশে উনিশ শতকেরপ্রথমার্ধে টমপেইনের রচনাবলী ছিল বাঙালী র‍্যাডিক্যালদের প্রেরণার একটিপ্রধান উৎস। দ্বিতীয়টির লেখিকা মেরি মাত্র আটত্রিশবছর বয়সে মারাযান; তাঁর গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যের স্বীকৃতি জোটে প্র ায় একশো বছর পরে। মেরিতাঁর বইয়ের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন , স্বাধীনতা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে নারী পুষের সর্বাঙ্গীন সাম্যেরপ্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। তসলিমা মেরির লেখা পড়েছেন কিনাআমার জানা নেই , কিন্তু এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি সমকালীন দুইবাংলামিলিয়ে মেরি ওয়লস্টোনক্র্যাফটের যোগ্যতমা উত্তরসাধিকা হচ্ছেন স্বদেশথেকে নির্বাসিত তসলিমা নাসরিন।

দ্বিখন্ডিতনামে তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনীর যে তৃতীয় খন্ডটি প্রথমে বাংলাদেশে এবংপশ্চিমবঙ্গে সরকারের দ্ব ারা নিষিদ্ধ হয়েয়ে, আমার বিবেচনায় সেটি একটিঅসামান্য গ্রন্থ। এই আলোচনার সূচনায় আমি মানুষের"আত্মনির্মাণ" সামর্থ্যের উল্লেখ করেছিলাম। মাতৃগর্ভেআমাদের চেহারা নানা রূপের ভিতর দিয়ে মনুষ্য প ধারণ করে। কিন্তুজন্মের পর থেকেই নানাভাবে চেষ্টা চলে শিশুকে সমাজস্বীকৃত ধাঁচেগড়ে তোলার। সেই উদ্দেশ্যটি হল সমষ্টিকৃত একটি ধাঁচের মধ্যে ফেলেব্যক্তির স্বকীয় স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করা। সমাজে যারাক্ষমতার দখলদার ধর্ম, ঐতিহ্য, শাস্ত্র, লোকাচ ার ইত্যাদির নামে তারা এইধাঁচে ফেলবার প্রক্রিয়াটি চালু করে। কিন্তু প্রতি শিশুর মধ্যেই নিহিত থাকে নিজস্ব একটি অস্মিতাঅর্জনের সামর্থ্য। তবে সেই অর্জনের জন্যলাগে ইচ্ছাশক্তি ও প্রয়াস, যুক্তিশীলতা এবং সততা, একনিষ্ঠ সাধনা ওঅনুশীলন। এখনো পর্যন্ত দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ সমাজ স্বীকৃত ছাঁচেইগড়ে ওঠে। কিন্তু কেউ কেউ তাদের প্রাজা তিক সামর্থ্যকে নিজের চেষ্টায় শত বাধা বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করেই ক্রমে বাস্তবায়িতকরেন- তাঁদের স্বোপার্জিত অস্মিতা তঁ াদের জীবনযাত্রায় ,চিন্তায়, ক্রিয়াকলাপে ভাবনায় এবং রচনায় প্রকাশিত হয় ।এইভাবেই আমরা পাই সক্রেটিস থেকে বিদ্য াসাগর জ্যোর্দানো ব্রুনো থেকেমানবেন্দ্র রায়। কিন্তু কীভাবে তাঁরা নিজেদের এই অনন্যতন্ত্র অস্মিতা গড়েতুলেছিলেন তার বিবরণ কচিৎ মেলে। এ ক্ষেত্রে ফরাসী নারীবিদ দার্শনিকসিমোন দ্য বোভেয়ার -এর মতো তসলিমা নাসরিনকেও ব্যতিক্রম মনে করি। খন্ডেখন্ডে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীর, এবং বিশেষ করে দ্বিখন্ডিত নামে তারতৃতীয় খন্ডটিরসবচাইতে বড় মূল্য এবং আকর্ষণ এটির ভিতর দিয়ে আমরাঅনেকটা জানতে পারি কীভাবে বহু বাধাবিপত্তি, আঘাত, অপমান, ও ব্যর্থত ারভিতর দিয়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত ঘরের একটি সাধারণ মেয়ে তাঁর আত্মশক্তিআবিষ্কার করেন, অপ্রতিম তসলিমা নাসরিন হয়ে ওঠেন । প্রথম দুটিখন্ডে যে ভূমিকা রচিত হয়েছিলতৃতীয় খন্ডে তা পরিণতি পায়। এই গ্রন্থের যেমন ঐতিহাসিক তেমনিসাহিত্যিক মূল্য প্রচুর। দুই বাংলার সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এ বইঅনেকেই পড়বেন, এর ঢাকঢাক গুড়গুড়হীন স্পষ্টতা অনেকের অপছন্দহবে। আবার অনেকেই এ বই থেকে আত্মরূপান্তরের প্রেরণা পাবেন।পশ্চিমবঙ্গে এখন যে সব বই জনপ্রিয় তাদের বেশির ভাগই অবক্ষয় এবংআপজাত্যের কাহিনী, অথবা লঘু রম্যরচনা। তসলিমার কষ্টের অন্তনেই, কিন্তু তিনি পারিপার্শ্বিক চাপের কাছে হারমানেন নি, নারী এবং পুষউভয়েরই ভিতরে মনুষ্যত্বের উজ্জীবনে তাঁর প্রয়াস অ াজওক্লান্তিহীন ।এই কেতাবে আবার তার পরিচয় পাই, এবং যেমন তাঁরঅস্মিতার তেমনি তাঁর আত্মপ্রকাশের অকুণ্ঠ তা রিফ করি।

তসলিমাতাঁর আত্মজীবনীর প্রথম দুটি খন্ডে তাঁর বাল্যকাল এবং বয়ঃপ্রাপ্তিরবিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। কিছুই রেখে ঢেকে লেখেন নি। ফলে দুইবাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের অধিকাংশ স্ত্রী-পুষ - যাঁরা সমস্তঅপ্রিয় সত্যকে ধামা চাপা দিয়ে রাখাকেই সভ্যতার আবশ্যিক সর্ত বিবেচনা করেন- স্বভাবতই খুববিচলিত হয়েছিলেন। তৃতীয় খন্ডেএসেছে তঁার যৌবনকালের কথা-প্রকৃতপক্ষে এখনো যা নির্মীয়মান , এই পর্বে তাঁর আত্মবিরচনের প্রয়াস স্পষ্টতরহয়, এবং তাঁর অনন্যতন্ত্র অস্মিতা প্রকাশ পেতে থাকে যেমন তাঁরজীবনে তেমনই তাঁরগদ্যপদ্য রচনায় । এই পর্বেই তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশেতুলকালাম কান্ড শু হয়, এবং মোল্লাদের একদল তাঁর ফাঁসীর ফতোয়া দেয়।এই নদীমাতৃক দেশে, যেখানে স্ত্রী-পুষদের স্বভাবে মাটি এবং জলেরপ্রাধান্যই স্পষ্ট যেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে" আমারমাথানত করে দাও হে তোমার চরণধূলার পরে" ভাবটি নিরতিশয়ব্যাপক, যেখানে উপরতলার মানুষের খোসামুদি এবং নীচের তলার মানুষকেঅপমান করাই স্বীকৃত রীতি, সেখানে এই দুঃসাহসী ব্যক্তিত্ব এহংঅগ্নিপ্রভ ভাষায় তাকে প্রকাশের সামর্থ্য কীভাবে অর্জিত হল ,সেটি জানা বাঙালির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য জরি। তসলিমার আত্মজীবনীরমধ্যে তাঁর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ যেমন ধরা পড়ে, তেমনি অঙ্কিতহয় ধাপে ধাপে তাঁর মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রয়াসগুলি । তাঁর নিজেরভিতরে যে সমাধানহীন দ্বন্দ্ব নিরন্তর সক্রিয় তাকেও তিনি এই পর্বে মেলেধরেছেন। যে দেশকে তিনি ভালোবাসেন কিন্তু যে দেশ তাঁকে নির্বাসনে পাঠিযেছে; সে মানুষদের তিনি ভালোবেসেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে এখনোভালোবাসেন, অথচ যারা বারবার তাঁর সেই ভালোবাসার সুযোগ নিয়েপ্রায় ক্ষেত্রেই তাঁকে ঠকিয়েছে, কখনো কখনো ভয়ঙ্করঅত্যাচার করেছে; স্বাধীনতা, সাম্য এবং সহযোগের ভিত্তিতে যে সমাজেরআমুল পুর্নগঠন তাঁর কাম্য, সেই স্থবির , অচলায়তন সমাজকে ধবংস করবারহিংস্রতা তাঁর স্বভাবে নেই। আরো অনেক অনুভুতিশীল এবং বিবেকী ব্যক্তিরমতো নিজের মধ্যেই এই বৈপরীত্যের উপস্থিতি তাঁকে ক্রমাগত পীড়াদিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় এই বোধ একদিকে তাঁর চারিত্রিকদার্ঢ্যকে নীরস হতে দেয় নি।

আত্মজীবনীর এই খন্ডের আলোয়তসলিমা নাসরিনের নিজেকে গড়ে তোলার ব্যাপারটিকে আরেকটু বেঝবারচেষ্টা করি। প্রচন্ডপ্রভুত্বাত্ম পিতা এবং হীনম্নতাগ্রস্তমাতার সন্তান তসলিমার ভিতরে দুটি প্রবণতা ক্রমেই আত্মসচেতনহয়েওঠে স্বাধীনতার উৎকাঙ্খা। কিন্তু যে পরিবারে এবং সমাজে তাঁর জন্মএবং বাস সেখানে কোনো নারীর পক্ষে স্বাধীন হওয়া অকল্পনীয়। সে চেষ্টা করতে গেলে পরিবারে এবং সমাজের সঙ্গে সঙঘাত অবশ্যম্ভাবী।অপরপক্ষে মার খেয়ে খেয়ে যারা প্রায় বোবা হয়ে গেছে (এবংতাদের মধ্যে তসলিমার মা-ও পড়েন) তাদের প্রতি তসলিমার মমতা যেমন গভীর তাদের নির্বাক সহনশীলতার প্রতি অশ্রদ্ধাও তেমনই প্রবল।তসলিমা ক্রমেই বুঝতে পারেন তাঁর নিজের স্বাধীনতা অর্জন মোটেই যথেষ্টনয় (তিনি ইতিমধ্যে পরীক্ষা দিয়ে চিকিৎসক হবার যেগ্যতা অর্জনকরেছেন) । সমাজের বাকি সবাই যদি স্বাধীনতা বঞ্চিত হয়ে থাকে তাহলে তাঁর স্বাধীনতাও ঠুনকো হয়ে দাঁড়াবে,নয়তো পর্যবসিত হবে স্বার্থপরতায়। অত্যাচারীর বিদ্ধে লড়াইয়ের ইচছাতাঁর মনে যেমন প্রবলতর হয়, অত্যাচারিতদের মনে লড়াইয়ের ইচছাজাগিয়ে তোলার দায়িত্ব বিষয়ে ততই তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন।

বয়ঃপ্রাপ্তির পর তসলিমা নিশ্চিতভাবে বোঝেন অন্যের পক্ষে যাই হোক, তাঁর নিজের পক্ষে স্বাধীনতা ছাড়া জীবনযাপন অসম্ভব। কিন্তু শুধু স্বাধীনতা নয় , মনুষ্যত্বেরবিকাশের জন্য অন্তত আরেকটি প্রয়োজন মেটানোও অপরিহার্য -সেটি হলো প্রেম। মুস্কিল বাধে, দায়িত্ববোধহীন স্বাধীনতা যেমন প্রভুত্বাত্মস্বার্থপরতায় পর্যবসিত হতে পারে, অনালোকিত প্রেম তেমনইপ্রায় ক্ষেত্রে দখলদারির চেহারা নেয়। স্বাধীনতা এবং প্রেমেরমধ্যে সামঞ্জস্য ঘটানো যে কত কঠিন পশ্চিমে তা প্রায় সর্বত্র প্রকটহয়ে উঠেছে। হয়তো প্রজ্ঞা এইসামঞ্জস্য ঘটাতে পারে, কিন্তু ক'জন তেমন প্রজ্ঞা অর্জন করে।বাস্তবে যা ঘটে, স্বাধীনতার নামে একপক্ষে যদি স্বাধীনতার বৃত্তিপ্রবল হয়, তাহলে প্রেমের সম্পর্ক দ্রুত ভেঙে পড়ে।

কিন্তু তত্বের কথা ছেড়ে তসলিমানাসরিনের নিজের লেখায় ফিরে আসি। তসলিমা জীবনে বহু পুষের সঙ্গ করলেওএকজনকেই সমস্ত দেহ-মন দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। বাংলাদেশে যখন সত্তরের দশকেযাই অন্য অনেক কবির মতো দ্রমহম্মদ শহিদুল্লার সঙ্গেও আমারপরিচয় হয়েছিল। সে সময়ে তসলিমার নামও শুনি নি। দ্রদের গাঁজার আড্ডাতেও আমিদু'একবার গেছি। ছোটখাটো মানুষটির কিছু কিছু কবিতায়প্রতিভার স্বাক্ষর ছিলো। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল

এই তণটির কোনো কথার ওপরেই নির্ভর করা যায় না; একেবারেই দায়িত্ববোধহীন বোহেমিয়ানড্রপ আউট। কিন্তু সত্তরের দশকে পৃথিবী জুড়েই বিদ্রোহের নামে বহুসংখ্যক তণতণীদের ভিতরে একটা প্রবল আত্মঘাতী প্রবনতা প্রকটহয়ে উঠেছিল। দ্রের বেশ কিছু ভক্ত ছিল। তণী তসলিমা ঘরছুট কবি দ্রেরকাছে নিজেকে সমর্পন করেন। সেই উত্তাল এবং বেদনাদীর্ণ প্রথম প্রেমেরকাহিনী তসলিমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খন্ডের অনেকটাই জুড়ে আছে । কিন্তু দ্রেরকি আদৌ ভালবাসার ক্ষমতা ছিল? বলা শক্ত। অপরপক্ষে তসলিমারপ্রেমে এতটুকু খাদ ছিল না। তবু তাদের বিয়ে ভেঙে গেল। যতদুর জানিদ্রের অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় খন্ডে দেখতে পাইদ্রের প্রতি তসলিমার প্রেম তখনও অটুট। স্বাধীনতাহীন জীবন নিরর্থ ,কিন্তু স্বাধীনতাই তো যথেষ্ট নয়। দ্রবিহীন " জীবনকে নিয়ে ঠিককোনদিকে যাব, কোথায় গেলে হুহু হাওয়া আমার দিকে বদ্ধ উন্মাদের মতছুটে আসবে বুঝে পাই না" ।সম্পর্ক ভেঙে যাবার পরও দ্র যখন তাঁকে হঠাৎ ঝিনাইদহে কবিতা পড়ার জন্যসঙ্গী হতে ডাকে, নির্দ্বিধায় তসলিমা তার সঙ্গে যান, সেখানে দ্র এবং অন্য কবিদেরসঙ্গে মঞ্চে যে যার কবিতা পড়েন, " অসত্যের বিদ্ধে , অসাম্যেরবিদ্ধে, স্বৈরাচার, অনাচার, অত্যাচারের বিদ্ধে সংগ্রামীকবিতা"। তারপর রাতে দ্রের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোন।"অনেক অনেকদিন পর দ্রআমাকে স্পর্শ করে গভীর করে।.... অনেকদিন পরে দুজনের শরীর একটি বিন্দুতে এসে মেশে। একবারওআমার মনে হয় না দ্র কোনো পরপুষ।" আর তারপর দ্র বলেতার সাম্প্রতিকতম ভালবাসার কথা-- শিমুল নামে একটি মেয়ের সঙ্গে-- অবলীলায়শোনায় তার সেই নতুন ভালবাসার গল্প -- তথা তসলিমা দ্রুত মুছে নেন তাঁরচোখের জল, বুঝতে দেন না দ্রকে তার নিজের কষ্টের কথা। (আমারমনে পড়ে যায় বার্ট্রান্ডিআর ডোরা রাসেলের দুই আত্মজীবনীতে এই একইঘটনার দুই একেবারে পৃথক বিবরণ)

প্রেম অনালম্ব থাকে, কিন্তুস্বাধীনতার প্রবল উচচাকাঙ্খা সে কারণে মোটেই হ্রাস পায় না।হ্রাস পায় না বাংলাদেশের ভাগ্যে যে সর্বনাশ ঘটছে তার চেতনা এবং তারবিদ্ধে দাঁড়াবার প্রত্যয়। তসলিমা দেখতে পান বাংলাদেশ "ধীরেধীরে অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আমার আশঙ্কা হয় ধর্ম নামেকালব্যাধির যে জীবানু ছড়িয়ে দেওয়াহচ্ছে, এতে ভীষন রকম আক্রান্ত হতে যাচ্ছে দেশের মানুষ"তসলিমা কোনো দলে যোগ দেন না, কিন্তু অংশ নেন এক সাংস্কৃতিক জোটে যেটিমুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দীপ্ত, যেখানে এসে সম্মিলিত হন বহু কবি, সাহিত্যিক,গানের নাচের , নাটকের শিল্পী , যাঁরা চান দেশে"সত্যিকারের গণতন্ত্র , সুস্থ সামাজিক পরিবেশেরপ্রতিষ্ঠা। তসলিমার মনে এই সিদ্ধান্ত ক্রমেই দৃঢ়তর হয় যেধর্ম হল কর্কট রোগের মত, একবার পেয়ে বসলে একের পর এক ধবংস করতেথাকে হাতের কাছে যা পায় তাই।... অন্ধকার ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুছড়ায় নি ধর্ম। মানুষের অজ্ঞানতা আর মৃত্যুভয় থেকে জন্ম নিয়েছে ধর্ম।একশ্রেরবাদী পুষেরা ধর্ম তৈরী করেছে তাদের আনন্দের জন্য, ইহলৌকিকসুখভোগের জন্য।" যে "মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন"তিরিশের দশকে ঢাকায় প্রবল আলোড়ন তুলে মোল্লাদের প্রবলতরবিরোধিতায় স্তব্ধ হয়েগিয়েছিল,তার পুনর্জ্জীবন হয়ে উঠে তাঁর সাধনা। এই সাধনা তাঁরঅস্মিতাকে সমৃদ্ধ করে, এবং গদ্যে ও কবিতায় তার প্রকাশ তাঁকেকরে তোলে ভারত উপমহাদেশের সবচাইতে বিতর্কিত লেখিকা।

৩

কিন্তু বিতর্কিত লেখিকা হবার আগেতসলিমা নাসরিন ডাক্তারিকেই বেছেছিলেন পেশা হিসাবে। আশা ছিল ফলে একদিকেতিনি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হবেন, তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় হবে,অন্যদিকে তিনি চিকিৎসার ভিতর দিয়ে দেশের স্ত্রী-পুষের সেবা করবেন।কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ব্যপারটা ঠিক এতটা সহজ নয় । তৃতীয় খন্ডশুহয়েছে চিকিৎসক হিসেবে তাঁর প্রথম দিকের একটি অভিজ্ঞতার বিবরণদিয়ে যে অভিজ্ঞতার গ্লানি তাঁর স্মৃতিতে অনপনেয় দাগ রেখে গেছে। শহরেঢুকেছে কলেরা রোগ, তসলিমার দিন রাত কাটে হাসপাতালে কলেরাচিকিৎসায়। এক সন্ধ্যায় সারাদিনের খাটুনির পর ডাক পড়ে বেশ দুরের একবাড়িতে। যে বাড়িতে কলেরা ঢুকেছে সে বাড়ির একটি মেয়ে তসলিমার ছোটবোনের বান্ধবী। রোগী দেখে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে যখন চলে আসেনবোনের বন্ধুটি তাঁকে ডাক্তারি ফি দেয়। কলে গিয়ে তসলিমার এইপ্রথম উপার্জন। কিন্তু বান্ধবীর বাড়িতে টাকা নেওয়াতে বোনের মুখভার, তসলিমার বাবাও সেটা পছন্দ করেন না, আর তারপর যখন খবর আসে অন্যরোগীরা হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে এলেও সেই বান্ধবীটি কলেরায় মারাগেছে (অন্যদের সেবা করতে এসে নিজের অসুখের কথা সে কাউকে বলেনি), তখন তসলিমার আর অনুতাপের অন্তা থাকে না। " ফিনেওয়ার জন্য নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। আয়নায় নিজের চেহারাটিবড় কুৎসিত লাগে, ঘৃণা ছুঁড়ে দিই। "

তবু স্বাধীন হতে গেলে ডাক্তারিইতাঁর অবলম্বন। কিন্তু ডাক্তারির চাকরি করতে গিয়ে একটির পর একটিঅভিজ্ঞতা হয়।- ওপরওয়ালাদের দাপট এবং পেজোমি , গরীবজনের অসহায়তা।সর্বব্যাপী অব্যবস্থা। যখন হাঁপিয়ে ওঠেন তখন অন্য সম্ভবনা আভাস পানসাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে। কিন্তু সেখানেই কি জল কম ঘোলা। সাহিত্য-সংস্কৃতিরজগতে যাদের মস্ত মানুষ ভেবে শ্রদ্ধা করতেন, ক্রমে আবিষ্কার করেন সভ্য মুখোশের আড়ালেতাঁদের অনেকের আসল চেহারাটা নিত ান্তই ঝুটা, মিথ্যাচার আরবুজকিতে ভর্তি। তবু ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওঠে এই প্রত্যয় , স্বাধীন এবংস্বনির্ভর হবেন, যা সত্য বলে বুঝেছেন তার কথাটাই লিখবেন, সেই মতো চলবেন,মিথ্যার সঙ্গে রফা করবেন না। ঝুঁকি নিয়ে যা অন্যায় তার প্রতিব াদকরবেন। তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকলে পাঠকমহলে আলোচনার ঝড়ওঠে , যাঁরা তাঁর বিদ্ধবাদী তারাও তাঁর বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করতে পারেননা। সমাজে নানা কুৎসা রটে, বাড়িতেউৎপাত শু হয়। বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র একা বাস করতে গিয়ে দেখেন সঙ্গে পুষ নাথাকলে কোনো বাড়িওয়ালা একাকী একটি মেয়েকে ঘর ভাড়া দিতে রাজি নন।প্রকাশক বন্ধু মজিবর রহমান খোকার চেষ্টায় অবশেষে সর্তসাপেক্ষে বাড়ি ভাড়া মেলে --সর্ত মেনে মাকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে অ াসেন। তারপর যখন গুছিয়ে বসেছেন, লেখক হিসাবে বেশ কিছুপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, তখনএকনোংরা পত্রিকায় মেয়ের দুন ামের ফাঁপানো ফোলানো বিবরণ পড়ে বড়ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হন সেই বাসায় দুর্ধর্ষ তাঁর ডাক্তার অধ্যাপকপিত া। প্রাপ্তবয়স্কা , আত্মনির্ভর , লেখক হিসেবে সুপরিচিত ডাক্তারকন্যাকে তাঁরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে, তাঁরবাড়িতে একটি ঘরে তালা দিয়ে বন্দী করে রাখেন কন্যাকে, চাবিটি রাখেননিজের পকেটে। বিবেচনা করে ঘরে একটি বালতি রাখেন " পেচ্ছাব,পায়খানা, বমি, কফ, থুতু সারতে হবে"। বন্দীশালায় মনে পড়েযোলো/সতেরো বছরের মেয়ে বাকুলির কথা, তাকে জন কয়েক মিলেবলাৎকার করবার পর যে আর কথা কয়না। যখন নির্বাচিত কলম ব াইরেসকালের মুড়ির মতো বিক্রি হচ্ছে, তখন তার বন্দী লেখিকা ঘরের মধ্যে চিৎকারকরেন, "সকলে শোনে, কিন্তু তালা খোলে না","যখন দলিত মথিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত আমি সাহসে বুক বেঁধে উঠেদাঁড়িয়েছি, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, সুন্দর একটি জীবন গড়ে তুলেছি, তখনইআবার আমাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলা হল"।

কিন্তু একদিন সুযোগ আসে। মা তালাখুলে একটা আওয়াজ শুনে দৌড়ে গেছেন রান্না ঘরে। এই সুযোগে বন্দিনী" যে কাপড়ে যে ভাবে ছিলাম, তেমনি দৌড়ে বেরিয়েযাই।" কিন্তু আবার সেই আস্তানার সমস্যা। ময়মনসিংহ থেকেঢাকায় এসেও রক্ষকহীন মেয়ের ঘর ভাড়া মেলে না। ওঠেন বন্ধু মিনারেরবাড়িতে। কিংকর্তব্যবিমুঢ় অবস্থায় সই করেন মিনারের আনা একটি সবুজখাতায় - এখন একত্র বাস সমাজসম্মত। প্রকাশক বন্ধু খোকা ভাড়াবাড়িঠিক করে দেন। সেখানে গিয়ে মিনারের আসল রূপটি প্রকট হয়।প্রতি রাতে সে মাতাল হয়ে ফেরে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে,কখনো- বা প্যান্টের বেল্ট খুলেতসলিমাকে চাবকায়। চুলের মুঠি ধরে ঘুম থেকে তুলে দরজার বাইরে ফেলেদিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। রক্তাক্ত আমি প্রাণে বাঁচার জন্য দৌড়ে গিয়েবাড়িওয়ালার বাড়িতে আশ্রয় নিই।..... ঘৃণায় আমি মিশে যেতে থাকি মাটিতে,নিজের ওপর ঘৃণা হয় আমার।... বাড়িওয়ালার বউ পাল ভয়ে থরথর হয়েকাঁপতে থাকা আম াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন অনেক কিছু ..... আমি কোনোপ্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি। আমি কি বাকুলি হয়ে যাচ্ছি।

(তসলিমার আত্মকাহিনীর এইজায়গায় পৌঁছে প্রায় অর্ধশতাব্দি আগেকার একটি ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতারকথা মনে পড়ল। সে সময়কার একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রের বিখ্যাত সম্পাদকসাম্য এবং সাম্প্রদায়িকতার মিশেল দিয়ে একটির পর একটি মহা-উত্তেজকসম্পাদকীয় লিখে তাঁর দৈনিকের প্রচার হুহু করে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজে তাঁর বিশেষ খাতির ছিল, কোনো কোনো প্রগতিশীল সভা-সমিতিতে তাঁরসঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ আলাপ আলোচনাও হত। এখনকার মতো তখনো বড়কাগজের সম্পাদক বা প্রধান সাংবাদিকরা বিনে খরচায় প্রচুরমদ্যপ ানের সুযোগ পেতেন। মিনারের মতো তিনিও প্রতি মধ্যরাতেপ্রমত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরতেন, পরনে ধুতি থাকায় বেল্ট দিয়েপেটানোর সুযোগ ছিল না, কিন্তু প্রতি রাত্রে তাঁর স্ত্রীর শাড়িটিকেড়েনিয়ে তাকে লাথি দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিতেন। পাশের বাড়ির মহিলাশাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতেন বিবস্ত্রা বউটিকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেবারজন্য। বউটির বাব াকে আমি চিনতাম, সে যুগে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁরও খ্যাতিছিল। তাঁর মুখে এই প্রাত্যহিক নৃশংসতার বিবরণ শুনে যখন বলেছি, চলুনপুলিশে খবর দিই, মেয়েকে আপনার বাড়িতে নিয়ে এসে বিবাহচ্ছেদের মামলাকরুন, তিনি ম্লান হেসে বলতেন জামাইয়ের সঙ্গে লড়াই করি এমন খ্যামতা কিআমার আছে, না ও বাড়ি ছাড়লেই ওমেয়ের হিল্লে হবে। এও আরেক

বকুলিরকাহিনী যে তসলিমা হতে পারে নি।)

তসলিমা বাসা ছেড়ে উঠে আসেনএকটি হোটেলে । পরে বাড়িওয়ালা মিনারকে বিতাড়িত করার পর আবার সেবাড়িতেফিরে যান। আর তখন ঘটে তাঁর জীবনের গভীরতম ক্ষতিরঅভিজ্ঞতা। হাসপাতালে দ্র তার শেষনিশ্বাস ফেলে। তার মৃত্যুর সংবাদে তসলিমার "শরীরের সব শক্তি যেনকর্পুরের মত উবে যায়"। চেয়ে দেখেন , " মেঝেয় কীনিশ্চিন্তে ঘুমে াচ্ছে দ্র। ... দ্র ,সেই দ্র, আমার ভালবাসার দ্র , দিবস রজনীআমি যার আশায় আশায় থাকি। একটিরেখা সাদা চাদরের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে দ্র। এই চাদরটিতে শুয়েছি আমরা কত রাত। কত রাত আনন্দরসে ভিজেছে এই চাদর । কত র াত এই চাদরের যাদুতে আমাদের সাত আসমানঘুরিয়ে এনেছে।" তারপর যখন না বুঝে উপায় থাকে না, দ্র নেই, তখন" শকুন খেয়ে যাওয়াগর পাঁজর যেমন পড়ে থাকে বধ্যভুমিতে , আমার পাঁজরও অনুভব করি তেমন।ভেতরে কিছু নেই। আমার চোখের কোটরে চোখ নেই। আমারখুলির মধ্যেমস্তিষ্ক নেই। সব খেয়ে গেছে কেউ।"

৪

কিন্তু তসলিমা তো রাধিকা নন।প্রেমহীন জীবন দুঃসহ , কিন্তু স্বাধীনতাহীন জীবন আরো দুঃসহ। তসলিমা ভালব াসারগভীরতম তল স্পর্শ করেছেন, " কিন্তু সমাজের হাজার যুক্তিহীন নিয়মঅস্বীকার করি যে আমার শরীর কেউ স্পর্শ করলে আমি পচেযাব।"তাঁকে তাঁর জীবনে এবং লেখার মধ্য দিয়ে এই সব নির্বোধ নিয়মের বিদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়।" আমি আমার নিয়মে চলতে যাই। যে নিয়মটিকে আমি পালনযোগ্য মনেকরি সেটি গ্রহণ করতে চাই, বাকি যেগুলি আমার আমিত্ব নষ্ট করেসেগুলোকে বর্জন করতে চাই। কোনো অযৌক্তিক কিছুর সঙ্গে , কোনো মন্দেরসঙ্গে মানিয়ে চলতে যে পারে পাক , আমি পারি না। আমি না পেরে দেখিয়েছিআমি পারি না।"

র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্ এই ত্রেডো যেমনতসলিমার অস্মিতাকে পুষ্ট করে , প্রকাশ করে, তেমনই অন্ধআগ্রাসী প্রাতিষ্ঠা নিক শক্তির সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা প্রবলতর করে তোলে, তাঁর শান্তিবাগেরবাসায় অতিথিরা আসেন যাঁরা হয়তো তাঁর এই ত্রেডোর প্রতিআকৃষ্ট , কিন্তু এটি অনুযায়ী জীবনযাপনের শক্তি এবং সাহস যাঁদের নেই। স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করারস্বপ্নসাধনকে তিনি এখন ছুঁড়েফেলে দিয়েছেন। " আমি ,স্বনির্ভর হব এবং একা থাকব, কোনো স্বামী নামে প্রভু পুষ অ ামারআশেপাশে থাকবে না, আমি হব আমার নিয়ন্ত্রক।..... এই জীবনটিকে অর্জন করতেআমাকে কম পথ পেরোতে হয় নি। ... দীর্ঘ কাল একটি অন্ধকার গুহারভেতরে আটকা পড়েছিলাম, আলোর কোনো ঠিকানা জানা ছিল না। নিজে আলে াখুঁজে খুঁজে বের করেছি, আলো আমি ছড়িয়ে দিতে চাই আর যারা অন্ধকারেআছে, তাদের দিকে । অন্ধকারে পড়ে থেকে স্যাঁতস্যাঁতে জীবন কাটাচ্ছে যারা, তাদের দিকে হাত বাড়াতে চাই, যেহাতটি ধরে তারা উঠে আসতে পারবে আলোর মিছিলে। আমার হাত কি তেমনকোনও শক্ত হাত ! শক্ত নয় জানি, তবু তো একটি হাত! এই একটি হাতই বা কেবাড়ায় !"

কিন্তু হাত বাড়াতে গিয়ে দেখা গেলএকদিকে যেমন অনেকেই এগিয়ে আসছেন সেই হাত ধরে অন্ধকার থেকে অ ালোরদিকে উঠতে , অন্যদিকে তেমনি অনেক কালো হাত চক্রান্ত করেছে ঐএকটি সাহসিকার হাত গুঁড়িয়ে দিতে।ফেব্রুয়া রির বইমেলায়যে নাটকীয় কান্ডটি ঘটে সেটির কথা সকলেই জানেন।সে সময়ে আমি সস্ত্রীক ঢাকায়। "তসলিমা পেষণ কমিটি"নামে একটি সংগঠন মেলায় এসে তসলিমার বই বিক্রি বন্ধ করে দেয়, বেশ কিছু বইপুড়িয়ে দেয়, বাংলা এক াডেমির মহাপরিচালকের নির্দেশে বইমেলায় তসলিমারযাওয়া নিষিদ্ধ হয়। তারপর নির্বাচিত কলাম-এর জন্য আনন্দ পুরষ্কারপাওয়ার ফলে দুই বাংলাতেই তিনি শুধু মৌলবাদীদের নন, অনেক প্রগতিবাদীরও কোপদৃষ্টিতে পড়লেন। এর পরের ঘটনাবলী তো বাংলাদেশে অন্ধকার যুগপ্রত্যাবর্তনের ইতিহাস। মৌলবাদীরা তাঁর ফাঁসীর দাবিতে নিয়মিত মিছিল বার করে, বাংলাদেশের সরকারতাঁর পরদেশ যাবার ছাড়পত্র দখল করে রাখেন, তাঁর লজ্জা উপন্যাস নিয়ে দুইদেশে খুব হৈ চৈ হয়, মৌলবাদী গুন্ডারা তাঁর বাড়ি আত্রমণ করে, পত্রিকায়, চিঠির বাক্সে, ফোনে ত্রমাগত হুমকি আসে খুনের, মাথা ফাটাবার, গণধর্ষণের।একদিকে তাঁর কুৎসায় ভরে যায় দেশ, অন্যদিকে কিছু কিছু বিশিষ্ট সাহসী বুদ্ধিজীবী তাঁরমতপ্রক াশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে লেখেন। তাঁকে নিয়ে বিদেশেও বিস্তর লেখালেখি আলোচনা শু. হয়ে যায়। আমার মনে অ াছে, আমি তখনঢাকায় , এক ফরাসী টেলিভিশন দল তসলিমার ব্যাপার নিয়ে একটি তথ্য চিত্রবানাতে এসে ছিল। তাঁরা আমাকে সলমান সদির সঙ্গে তসলিমা নাসরিনের তুলনাকরার অনুরোধ করায় আমি বলি" শদি আছেন সুরক্ষিত ভ াবেব্রিটেনে , তিনি গল্পচ্ছলে ধর্মকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, সমাজের পরিবর্তননিয়ে তাঁর এতটুকু দায়িত্ববোধ নেই। আর

তসলিমা বাস করেছেন আগ্রাসীমোল্লাদের আত্রমণের সামনে, তাঁকে রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, আরতিনি কোনো সুররিয়ালিস্ত্ কায়দায় গল্প ফাঁদছেন না। সরাসরিইধর্মীয় মৌলবাদকে তাঁর কলামে, কবিতায়, উপন্যাসে আত্রমণ করেছেন, আরতারি সঙ্গে গড়ে তুলতে চাইছেন সমাজ এবং সংস্কৃতির রূপান্তরের একটি আন্দোলন। শদি বড় সাহিত্যিক হতেওপারেন, কিন্তু তসলিমার সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনাই হয় না, কারণ তসলিমাঅপরিসীম সাহসে একটা চিন্তা- বিপ্লব এবং সমাজবিপ্লবের গোড়াপত্তনকরেছেন। দক্ষিণ এসিয়ার মানস ইতিহাসে তাঁর ভুমিকা অনেক বেশীগুত্বপূর্ণ।

আত্মজীবনীর তৃতীয় খন্ডে ঘটনাবলীরবৃত্তান্ত শেষ হয়েছে যে সময়ে তসলিমা তখনো দেশ থেকে নির্বাসিত হয়নি।তাঁর শত্রুরা যতই পরাত্রান্ত হোক , তাঁর নির্ভীক স্বাধীন মনকেতারা ছুঁতে পারেন নি। কিন্তু যে স্বনির্ভর অস্মিতা তিনি অর্জন করেছেনতার জন্য তাঁকে মস্তক মূল্যও দিতে হয়েছে। তাঁর মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যস্বাধীনতা এবং প্রেম দুই-ই ছিল অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু বহু পুষেরসঙ্গে সম্পর্ক হলেও তাঁর জীবনে প্রেম স্থিতি পায় নি। কখ্যনা কখনো তাইবড় নিঃসঙ্গ বে াধ করেন। " কোনো উতল প্রেমে যদি একবারভাসতে পারতাম। ইচ্ছেটা আমার বুকের ভেতর কোথাও লুকিয়ে থ াকে।হঠাৎ হঠাৎ মন যখন উদাস হয়ে আসে, একা বসে থেকে ইচ্ছেটাকে টের পাই,আলতো করে তুলে নিয়ে ইচ্ছেটির গ ায়ে আমি নরম আঙুল রাখি।"হয়তো বইটির দ্বিখন্ডিত নাম রাখবার এটিই সূত্র।

এমন একটি অসামান্য সাহসী ও সৎআত্মোদ্ঘাটনকে কী বিচারে পশ্চিমবঙ্গের সরকার নিষিদ্ধ করলেন, আম ারপক্ষে অনুমান করাও শক্ত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজে লেখক এবং সংস্কৃতিমনস্কবলেই জানি। আমাদের সংবিধানে অন্তত যে দিকটি নিয়ে আমরা গর্ববোধকরতে পারি সেটি হল নাগরিকদের মৌল অধিকারের স্বীকৃতি । যাঅন্তরের তা ব াইরে প্রকাশের অধিকার মানুষের মৌল অধিকার।বইটি নিয়ে আলোচনা হোক, তর্কবিতর্ক হোক, কিন্তু একেবারে অব াস্তবঅজুহাতে বইটিকে নিষিদ্ধ করা স্পষ্টই অন্যায় এবং আমাদের গণতান্ত্রিকসংবিধান বিরোধী। তসলিমা নাস্তিক এ কথা সকলেই জানেন। ধর্ম, বিশেষ করেমৌলবাদী ধর্মের বিদ্ধে তাঁর অভিযান নির্বাচিত কলাম-এর বহু পূর্বেই ঘোষিতহয়েছিল। সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে শান্তিভঙ্গ করবেন এতাবৎ তার কোনো চিহ্নই দেখা যায় নি। বরং আমার মনে পড়ে আমারমেয়েবেলা প্রকাশ উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যে সম্বর্ধনা সভা করা হয়েছিল , যারসভাপতি ছিলেন প্রয়াত বিবেকী ভাবুক অন্নদাশঙ্কর রায়, সেখানেতিল ধারণের জায়গা ছিল না। সিঁড়ি থেকে সর্বত্র স্ত্রী-পুষ পরম অ াগ্রহেতসলিমার আত্মজীবনীর প্রথম খন্ডপাঠ শুনেছিলেন। দ্বিখন্ডিত নিষিদ্ধ করেমুখ্যমন্ত্রী বিপজ্জনক নজীর সৃষ্টি করেন। অ াজকের ইনফরমেশ্যন টেকনলজিরযুগে বই পড়া কোনো সরকারই আটকাতে পারে না। কিন্তু আমরা যেস্বাধীনতা অর্জনের পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বেছে নিয়েছি, কোনোস্বৈরতান্ত্রিক দেশের অনুকরণ করি নি,এটি বিবেচনা করে তিনি অ াশা করি এই অন্যায্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারকরে নেবেন। যারা নির্বাচিত কলাম অথবা মেয়েবেলা পড়ে দাঙ্গা করতে যায় নি,দ্বিখন্ডিত পড়ে তাদের রক্ত মাথায় ওঠার সম্ভাবনা দেখি না।

কেউ কেউ অশ্লীলতার অভিযোগকরেছেন। হায়, আমরা শুধু তো তত্বচিন্তা করি না, হাগি মুতি, সৌভাগ্যথাকলে বয়সকালে সঙ্গমে ব্রহ্মস্বাদও লাভ করি। সাহিত্য তো জীবনের সবটা নিয়ে,এবং ভাষা নিয়ে ছুঁৎমার্গ অবলম্বন সা হিত্যিকের সাজে না। তসলিমা একেসাহিত্যিক, তায় অভিজ্ঞ ডাক্তার। আর ঢাকঢাক গুড়গুড় তাঁর স্বভাবনয়। রাবলে- শেক্সপীয়র থেকে কুমার সম্ভব বা বিদ্যাসুন্দরের শিল্পী কে ই-বা তথাকথিতঅশ্লীলতার তোয়াক্কা করেছেন? আমরা কি এখনো রাত ভরেবৃষ্টি বা বিবর - এর কাল পেরিয়ে আসিনি?

অনেকের ধারণা তসলিমা নাসরিনউগ্র রকমের পুষবিদ্বেষী। আসলে তাঁর আত্রমণ পুষতন্ত্রের ওপরে,পুষজাতির ওপরে নয়। তাঁর সাম্য গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন ,"পুষকৃতব্যবস্থাবলীর উদ্দেশ্য তাই যত প্রকার বন্ধন আছে সকল প্রকারবন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুষপদমূলে স্থাপিত কর- পুষগণস্বেচ্ছাত্রমে পদাঘাত কক। অধম ন ারীগণ বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে নাপারে।" এই পুষতন্ত্রের সঙ্গে তসলিমা সারাজীবন লড়াই করেছেন-এর সঙ্গে তাঁর অ াত্মজীবনী থেকেই জানতে পারি পুষতান্ত্রিক নন এমন বহু পুষইতাঁর শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের তিনি বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করেছেন- যেমন তাঁরনাস্তিক বড় মামা, আদর্শবাদী নির্লোভ সমাজসেবী যতীন সরকার, তাঁরপ্রকাশক মজিবর রহমান খে াকা, তাঁর কবিবন্ধু নির্মলেন্দু গুণ, শামসুররাহমান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অসীম সাহা, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ডক্টররশীদ, মুক্তবুদ্ধি অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা, ঔপন্যাসিক হুমায়ুণ আহমেদ, প্রাজ্ঞ নাস্তিক আহমদ শরীফ,স্বল্পভাষী সৎ

ড্রাইভার সাহাবুদ্দীন , এবং আরো অনেকে। তসলিমা চান অসাম্যএবং অত্যাচারের অবসান, চান স্ত্রী এবংপুষ উভয়েই যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জনকরুন, সমাজসংগঠন , মানবীয় সম্পর্ক ,রীতিনীতি সাম্য এবং স্বাধীনতারভিত্তিতে গড়ে উঠুক । পুষতন্ত্রের দাপটে যে অসংখ্য মেয়ে মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ পায়নি তাদেরজন্য তাঁর মনে যেমন গভীর মমতা, যেমেয়েরা এই অসাম্য এবং অত্যাচারকেই আল্লার বিধান বলে মেনে নিয়েছে তাদের প্রতি তাঁর তেমনি তীব্রবিরাগ। অপর পক্ষে সৎ এবং সাহসী মেয়েদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা - যেমন ফেরদৌস প্রিয়ভাষিনী অথবা ভাস্কর শামীমসিকদ ার। কিন্তু এ আশঙ্কাও তাঁর মনে জাগে যে স্বাধীন , স্বনির্ভর হতে গিয়ে তিনিও বুঝি - বা তাঁর নিষ্ঠুর ,প্রতাপশালী বাবার ছোট সংস্করণহয়ে উঠছেন। " মার দারিদ্র , মার হতভাগ্য, মার রূপহীনতা, মারহীনমন্যতা , মার নুয়ে থাকা, মার কষ্ট , ম ার নির্বুদ্ধিতা, মারবোকামো, মার ধর্মপরায়ণতা , মার কুসংস্কার কোনও দিন আমাকেআকৃষ্ট করে নি। এ সব আমাকে মা থেকে কেবল দূরেই সরিয়েছে। মা আমার সংসারে নিজেকে প্রয়োজনীয়করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করে যান। তবুও আম ার মাকে বাড়তিমানুষ মনে হয়। " এই চেতনা, নিজের সম্পর্কে এই আশঙ্কাবোধ যার আছে, নিজের ভিতরকারপ্রভুত্বাত্ম প্রবণতাকে তিনি নিজেই সংযত করবেন, এ আশঙ্কা অসঙ্গতঠেকে না।

এখন থেকে প্রায় একশ'বছর আগে বেগম রোকেয়া লিখেছিলেন " আমাদের যথাসম্ভব অবনতিহওয়ার পর দ াসত্বের বিদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই তাহার প্রধানকারণ এই বোধ হয় যে যখনই কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টাকরিয়াছেন, তখনই ধর্মের দোহাই অথবা শাস্ত্রের বচন রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণহইয়াছে। ..... আমাদের অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুষগণ ঐধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" এই দুঃসাহসীসত্যঘে াষণার জন্য তাঁকে যথেষ্ট নিগ্রহ সইতে হয় , এবং গ্রন্থাকারেপ্রকাশের সময়ে নবনূর -এ প্রকাশিত মূল প্রবন্ধটির কিছু অংশ বাদ দিতে হয়। একশ' বছরপরেও প্রস্তাব শুনছি তসলিমার বইটি থেকেও কিছু অংশ বাদ দিলেসেটির ওপর নিষেধ াজ্ঞাপ্রত্যাহৃত হতে পারে। একশ' বছর পরেও কি আমরা অতীত সময়েরসেই দুঃসহ বিন্দুটিতেই দাঁড়িয়ে আছি?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com